ভ্রমণ-রচনাবলি

দ্বিতীয় খণ্ড

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহ্য

ঊর্মিমুখর
৩

ভ্রমণসূচি

ঊর্মিমুখর ৭
বনে-পাহাড়ে ৮৫
উৎকর্ণ ১৬১

ঊর্মিমুখর

অনেকদিন এবার গ্রামে আসিনি। প্রায় মাস-তিনেক হল। এবার দেশে গরমও খুব। একটুকু বৃষ্টি নেই কোনদিকে। দুপুরের দিকে হাওয়া যেন আগুনের হলকার মতো লাগে।

এবার গ্রামে এসে আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখি সলতেখাগী আমগাছটা ঝড়ে ভেঙে গিয়েছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। সলতেখাগী ঝড়ে ভেঙে গেল! ও যে আমার জীবনের সঙ্গে বড়ো জড়ানো নানাদিক থেকে। ওরই তলায় সেই ময়নাকাঁটার ঝোপটা, যার সঙ্গে আবাল্য কত মধুর সম্বন্ধ।

সলতেখাগীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে জ্বালানি করবে এবার হাজারী কাকা। সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপনার নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ অনুভব করলুম।

গাছপালাকে সবাই চেনে না। এতদিনের সলতেখাগী যে ভেঙে গেল, তা নিয়ে আমাদের পাড়ার লোকের মুখে কোনো দুঃখ করতে শুনিনি।

পথের পাঁচালীতে সলতেখাগীর কথা লিখেচি। লোকে হয়ত মনে রাখবে ওকে কিছুদিন।

খুকুদের কাল আসবার কথা গিয়েচে দু-ধার থেকে। আজও এল না, বোধ হয় আবার জ্বর হয়ে থাকবে।

আজ বিকেলে বেলেডাঙার পথে বেড়াতে বার হয়েছি, পথে গিয়ে বসেছি গঙ্গাচরণের দোকানে, কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে গল্পসল্প করছি, এমন সময়ে কী মেঘ করে এল সুন্দরপুরের দিক থেকে! গঙ্গাচরণ বললে, খুব বৃষ্টি এল। আমি ওর দোকান থেকে বার হয়ে যেমন এসে বাঁওড়ের ধারের পথে পা দিয়েছি, অমনি বেলেডাঙার ওপারের বাঁশবনের মাথার ওপর কালবৈশাখীর মেঘের নীল নিবিড় রূপ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কোথা থেকে আবার এক সারি বক সেই সময় নীল মেঘের কোলে উড়ে চলেছে—সে কী অপরূপ রচনা! এদিকে মনে ভয় হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরতে হবে, ঝড় মাথায় মাঠের মধ্যে থাকা ভালো নয়, অথচ যাবো তার সাধ্যি কী! পা কি নাড়তে পারি? তারপর সোঁদালি ফুলের-ঝাড়-দোলা বনের ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলাম

আমাদের ঘাটে। সেখানে স্নান করে যখন আমাদের গুয়াতেলির তলা দিয়ে যাচ্ছি—হাজারী জেলেনি সেখানে আম কুড়ুচ্ছে—বড় চারার তলাতেও রথযাত্রার ভিড়। বৃষ্টি এল দেখে পালিয়ে বাড়ি এসে ঢুকলাম।

সলতেখাগী আমগাছটা একেবারে কেটে ফেলে করাতীর দল তক্তা তৈরি করছে। হাজারী ঘোষ রোডসেস নিলামে বাগান কিনেছে—ওই এখন তো কর্তা। ও কি জানে সলতেখাগীর সঙ্গে আমার বাল্য-জীবনের কী সম্পর্ক!

কাল বিকেলে গোপালনগরে গিয়ে হাজারীর বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে ছিলুম। তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে ফর্দ ইত্যাদি করা হচ্ছে, সকলে খুব ব্যস্ত। এমন সময়ে অনেকদিন আগেকার দেখা সেই ভদ্রলোকটি, হলদিবাড়িতে যাঁর পাটের ব্যবসা ছিল, তিনি এলেন। আজ প্রায় পনেরো বছর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি যখন কলেজে পড়তুম—ইনি তখন এই গ্রীষ্মের বন্ধের সময়ই মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। মতি দাঁয়ের দোকানের বাইরের বারান্দায় বসে এঁর সঙ্গে কত কী আলাপ হত। তখন এঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ, এখন পঁয়ষট্টি। কিন্তু তখন ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, ঘোর তার্কিক ছিলেন, অনেক ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতেন। এখন হয়ে পড়েছেন একেবারে অন্য রকম। আর কিছুতেই উৎসাহ নেই, নানারকম বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন। একটা প্রধান বাতিক তার মধ্যে এই দেখলুম যে ওঁর বিশ্বাস, ওঁর শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে, আর সারবে না। আমি কত বোঝালুম, বললুম, 'আপনার বয়েস হয়েচে, তার তুলনায় আপনার শরীর ঢের ভালো। কেন মিছে ভাবচেন?' ভদ্রলোকের ছেলে আমার সঙ্গে গোপালনগর স্কুলে পড়ত অনেক দিন আগে। সে ছেলেটি শুনেচি মারা গিয়েচে। আমি সে কথা জিগ্যেস করিনি।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে খানিকদূর এলেন। আমি তাঁকে বোঝাতে বোঝাতে এলুম। তুঁততলায় স্কুলের কাছে তিনি চলে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়েছে, মাথার ওপর বৃশ্চিক উঠেছে, জ্বল জ্বল করছে নক্ষত্রগুলো—বাঁওড়ের মাথার ওপরে উঠেছে সপ্তর্ষি। এতক্ষণ বিয়ের বড়োলোকি-ফর্দরূপ বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে থেকে মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল, এইবার এসে আকাশের দিকে মুক্ত বহুদূর নাক্ষত্রিক জগতের দিকে সেটা ছড়িয়ে দিয়ে বাঁচলুম।

হাট থেকে এসে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলুম। বেলা খুব পড়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের নির্মেঘ অপরাহ্নের শোভা এত সুন্দর যে যার অভিজ্ঞতা নেই তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না। এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে বসে কত কথাই মনে আসে!

হাজার বছর কেটে যাবে—এই রঙিন মেঘমালা, এই গায়কপাখির দল, এই সব নরনারী, গাছপালা—কোথায় ভেসে যাবে কালস্রোতে, কিন্তু মানুষ তখনো থাকবে। নতুন ধরনের কী রকম মানুষ আসবে, কী রকম হবে তাদের সভ্যতা, কী জ্ঞানের আলো তারা পৃথিবীতে জ্বেলে দেবে—এই সব ভাবি।

নদীতে স্নান করতে নেমেছি, পুঁটি দিদি তখনো ঘাটে। বৃশ্চিক রাশির একটা নক্ষত্র খুব জ্বল জ্বল করছে। নদীর ওপারে সাঁই-বাবলা গাছগুলোতে অস্তদিগন্তের রঙিন মায়া-আলো পড়েছে।

সারারাত কাল আম কুড়িয়েচে লোকে লণ্ঠন ধরে। আমার মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে, মাঝে মাঝে দেখি সবাই আম কুড়ুচ্ছে।

কাল করুণার সঙ্গে আকাইপুরে গেলুম যেমন প্রতি বৎসর যাই। করুণার মায়ের মুখে সেখানের গল্প শুনে বড়ো তৃপ্তি পাই। সহায়হরি ডাক্তারের দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা আবার শুনলুম। সে কত করুণ কাহিনী। তারপর শুনলুম মধু মুখুয্যে ও প্রেমচাঁদ মুখুয্যের বাড়ির ডাকাতির গল্প। এ গল্প অবিশ্যি আমি ছেলেবেলায় শুনেছি, তবুও আবার ভালো করে শুনলুম। করুণাদের বাড়ির অতিথি-সেবা ও তার বাপের টাকা ওড়ার গল্প বড়ো মজার। টাকা আদায় করে নিয়ে আসছিল গোমস্তা। ২৫০ টাকার হিসাব দিলে না। বললে, কর্তা মশায়, মাঠে ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, টাকাগুলো উড়ে গিয়েছে, আর পেলুম না। ওর বাবা তাকে রেহাই দিলেন। মরবার আগে সবাইকে ডেকে যত বন্ধকি খত সব ছিঁড়ে ফেললেন। ওঁর ছেলেরা কার নামে নালিশ করতে যাচ্ছিল, করুণার মা বললেন—শোন, তা তো হবে না, কর্তা বারণ করে গিয়েছেন মরবার সময়ে। ওদের পীড়ন করতে পারবে না। যা দেয় নাওগে যাও।

একদিকে যেমন করুণার বাবা, অন্যদিকে তেমনি সহায়হরি ডাক্তার। সহায়হরির মত অর্থপিশাচ মানুষ পাড়াগাঁয়ে বেশি নেই। খতে টাকা উসুল দিলে দেয় না, অথচ আদায়ী টাকার জন্যে খাতকের নামে নালিশ করে। চক্রবৃদ্ধি-হারের সুদের এক আধলা রেহাই দেবে না খাতককে।

বিকেলে একটু মেঘ করেছিল। গঙ্গাচরণের দোকানে কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলুম। আমি বললুম—কী রাঁধলেন, কবিরাজ মশাই?—কণ্টিকারীর ফল ভাজা আর ভাত। এই কবিরাজটি বড়ো অদ্ভুত মানুষ। বয়স প্রায় সত্তর হবে, কিন্তু সনানন্দ, মুক্তপ্রাণ লোক। কোন দেশ থেকে এদেশে এসেছে কেউ জানে না। বিশেষ কিছু হয় না এই অজ পাড়াগাঁয়ে। তবুও আছে, বলে—

এদেশের ওপর মায়া বসে গিয়েছে। সোঁদালি ফুল দিয়ে একটা বালিশ তৈরি করেছে, সেই মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকে।

একটু পরে ঘন মেঘ করে এল। বেলেডাঙার ওপারে বাঁশবনের মাথার ওপরকার আকাশে সে কী সুনীল নিবিড় মেঘসজ্জা! মেঘের কোলে আবার একসারি বক উড়ল। কী রূপ যে হল, আমি বৃষ্টির ভয়ে পালাচ্ছিলুম, কিন্তু সৌন্দর্য দেখে আর নড়তে পারিনে। কে একটি মেয়ে নদীর এপারে কালো চুলের রাশি খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কী চমৎকার ছবিটি!

আজ বেশ মনের আনন্দ নিয়েই সকাল সকাল বেলেডাঙা গিয়েছিলুম। তখনো চারটের গাড়ি যায়নি। গঙ্গাচরণের দোকান খোলেনি। আইনদ্দির বাড়িতে তেলপড়া নেবার জন্যে পাঁচী পাঠিয়েছিল আমার সঙ্গে জগোকে ও বুধোকে। আইনদ্দির বাড়িতে ছেলেবেলাতে একবার গিয়েছিলুম, ওর ছেলে আহাদ মণ্ডল তখন বেঁচে ছিল। আইনদ্দির বাড়িটা কী চমৎকার স্থানে! সেখান থেকে দূরের মেঘভরা আকাশের নিচে প্রাচীন বট অশ্বত্থের সারি কী অদ্ভুত দেখাচ্ছিল! আইনদ্দি চকমকি ঠুকে শোলা ধরিয়ে তামাক সাজলে ও একটা শোলা ফুটো করে আমায় তামাক খেতে দিলে। তারপর সে কত গল্প করলে বসে বসে। ১২৯২ সালে সে প্রথম এদেশে এসে বাস করে। তখন তার বয়েস বিয়াল্লিশ বছর। সে বছর বন্যার জল উঠেছিল তার উঠোনে। মরা গাঙ তখন ইছামতী ছিল, একথা কাল মতি মণ্ডলও জলের ওপর দাঁড়িয়ে আমায় বলেছিল। আইনদ্দি বললে—বড্ড ফুর্তি করেচি মশাই, যাত্রার দলে গাওনা করেচি, বহুরূপী সেজেচি, বেহালা বাজিয়েচি। আপনাদের শাস্তরটা খুব পড়েচি। ধরো গিয়ে বেরষোকেতু, সীতার বনবাস, বিদ্যেসুন্দর সব আমার মুখস্থ। তারপর সে 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে খানিকটা মুখস্থ বলে গেল। মহাভারত থেকে 'দাতাকর্ণ' খানিকটা বললে। এখন ওর বয়েস নব্বুইয়ের কাছাকাছি, এই বয়েসও সে নিজে চাষবাস দেখে। সে হিসাবে আমি তো নব্য যুবক। আমার সামনে এখন কত সময় পড়ে আছে। মনে করলে কত কাজ করতে পারি। কাল মতি মণ্ডলকে ঘুনি তুলতে দেখেও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল।

আইনদ্দির বাড়ি থেকে সুন্দরপুরের পথে খানিকটা বেড়াতে গেলুম। মরাগাঙের বাঁকে দাঁড়িয়ে আরামডাঙার ওপারের চক্রাকার আকাশের নীলমেঘের সজ্জার দৃশ্য যেন মনকে কতদূরে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল।

পথে আসতে আসতে একটা করুণ দৃশ্য দেখে সন্ধ্যাবেলাটা মন বড়ো খারাপ হয়ে গেল। গোয়ালাদের একটা ছোটো মেয়েকে তার মা ঘরের উঠোনে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারছে, আর মেয়েটা কাঁদছে। আহা, নিজের

সন্তানের ওপর অত নিষ্ঠুরভাবে হাত ওঠায় কী করে তাই ভাবি! কী করব, আমার কিছুই করবার নেই। এদিকে বৃষ্টি পড়চে টিপ টিপ করে, সঙ্গে দুটো ছোটো ছোটো ছেলে, তাড়াতাড়ি কুঠির মাঠের বনের পথ দিয়ে আমাদের আর বছরের চড়ুইভাতির জায়গাটা বুধোকে আর জগোকে একবার দেখিয়ে— তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলুম।

আজ দিনটা মেঘে মেঘে কেটেছে। কিন্তু সকালবেলায় একটু সূর্যের মুখ দেখেছিলুম। মেঘ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। দুপুরে ঘুমুচ্ছি, জগো এসে ওঠালে। একটু পরে খুকুও এল। জানলার গরাদটা ধরে দাঁড়িয়ে তার নানা গল্প। তার মাথা নেই, লেখাপড়া কী করে হবে...এই সব কথা। আমার কর্তব্য হিসাবে তাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলুম। তারপর পাঁচীকে আর ওকে রোয়াকে বসে সূর্য ও গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বললুম। খুকু বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনলে। বললে, এ আমার বেশ ভালো লাগে। সূর্য সম্বন্ধে কিছুই জানতুম না। আরো বলবেন একদিন।

তারপর আমি বেলেডাঙার মাঠে বেড়াতে বার হলাম। কী সুন্দর বিকেলটা আজ! ঠাণ্ডা অথচ পথঘাট শুকনো খটখট করছে। মাঠের গাছপালাতে সোনালি রোদ পড়েছে। কুঠির মাঠে যেতে যেতে প্রত্যেক সোঁদালি গাছ, ঝোপঝাপ, বাঁশবন আমার মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করছে। নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে তাই মনের আনন্দ জানালুম। কুঠির মাঠে ঘাসের ওপর জল বেধে আছে।

কবিরাজ ও গঙ্গাচরণ পথের ধারে মাদুর পেতে বট-অশ্বত্থের ছায়ায় বসে গল্প করছে। কাপড় কেটে কবিরাজ নিজেই জামা সেলাই করছে। শুকনো ভেষজ পাতালতা কলকাতায় চালান দেবে, তারই মতলব আঁটছে। বড়ো ভালো লাগল বিশেষ করে আজ ওদের গল্পসল্প। আসবার সময় ছাতা নিয়ে এলুম, তখন রাত হয়ে গিয়েছে, আমাদের ঘাটে যখন নাইতে নেমেছি, আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেছে।

ক-দিনই মনে কেমন একটা অপূর্ব আনন্দ। বিশেষ করে যখনই কুঠির মাঠে যাবার সময় হয়, তখনই সেটা বিশেষ করে হয়। কাল যখন বিকেলে ঘন নীলকৃষ্ণ মেঘ করল, তার কোলে বক উড়ল, তখন আমি সেদিকে চেয়ে এক জায়গায় বসে আছি। আবার যখন পুলের রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াই, অস্ত-আকাশের পটভূমিতে সবুজ বাঁশবনের দিকে চেয়ে থাকি, তখন আমি যেন শত-যুগজীবী অমর আত্মা হয়ে যাই। সেদিন যেমন হয়েছিল, আজও তাই

হল—বেলেডাঙার ওদিকের মোড় থেকে চক্রাকৃতি দিগ্বলয়হীন শ্যাম বেণুবনের অপূর্ব শোভায় মেঘধূসর আকাশতলে মন এক অপূর্ব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন এই শুকনো মরাগাঙে আবার ইছামতী বইবে, তখন আমি কোন নক্ষত্রে রইব—কতকাল পরে—কে জানে সে খবর? বাবলার সোনালি ফুল দোলানো গাছের তলা দিয়ে সেই পথ। ভাবতে ভাবতে চলে এলুম। পুলের ওপর খানিকটা দাঁড়াই। সেই কতকালের প্রাচীন বট-অশ্বত্থ, কতকালের আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ি ও বাঁশবনের সারি। মনে এ কয়দিনই সেই অপূর্ব অনুভূতিটা আছে। পুলের পাশে একটা হেলা বাবলা গাছে ফুলের কী বাহার! যখন নদীর ঘাটে এসে নামলুম স্নান করতে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে শুধু বৃশ্চিকের একটা নক্ষত্র অস্পষ্টভাবে জ্বলছে। মাথার উপর দ্যুতিলোক, চারিদিকে নীরব অন্ধকার, নদীজল ও গাছপালার দিকে চেয়ে মনে যে ভাব এল, তা মানুষকে অমরতার দিকে নিয়ে যায়। বুড়ো ছকু পাড়ুই এই সময় তার স্ত্রী আদাড়িকে সঙ্গে করে নদীতে গা ধুতে এল। সে অন্ধকারে চোখে দেখতে পাবে না বলে স্ত্রী ওর সঙ্গে এসেছে।

সকালে উঠে কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে আজ বড়ো আনন্দ পেলাম। দুপুরে পাটশিমলে রওনা হওয়া গেল পায়ে হেঁটে। কবিরাজ মশায় পাঠশালায় ছেলে পড়াচ্ছেন, তাঁর কাছে বসে একটু গল্প করে বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা পথ দিয়ে মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে গিয়ে পার হলাম। কেউটে পাড়ার কাছে গিয়েছি, এক জায়গায় অনেকগুলো বেলগাছ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে। সেখানে বড়ো বৃষ্টি এল। পুবদিকের আকাশ বৃষ্টিধোয়া, নীল; পরিষ্কার সেই ইন্দ্রনীল রঙের আকাশের পটভূমিতে দূর গ্রামের তাল-খেজুরের সারি, বাঁশবনের শীর্ষ কী চমৎকার দেখাচ্ছে! আর এদিকে ঘন কালো বর্ষার মেঘ জমেছে। গোবরাপুরের মোড় বেঁকে কুদীপুরের বাঁওড়ের ওপারে রানীনগর বলে ছোটো একটা চাষা-গাঁয়ের দৃশ্য ঠিক যেন ছবির মতো। এখানে একজন বৃদ্ধাকে পথ জিজ্ঞেস করলুম। তিনি বললেন—তোমার নাম বিভূতি? সাতবেড়েতে একবার গিয়েছিলে না? আমি বললুম—হ্যাঁ। আপনি কী করে চিনলেন? তিনি নিজের পরিচয় দিলেন না। গোবরাপুরের একটা দোকানে মণীন্দ্র চাটুয্যের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। সেখানে বসে একটু গল্প করেই আবার পথে বেরিয়ে পড়ি। কী ঘন বন পথের দু-ধারে। বড়ো বড়ো লতা কালো কালো গাছের গুঁড়ির গায়ে উঠেছে—এই কয়দিনের বৃষ্টিতেই গাছের তলায় বনের ছোটো ছোটো গাছপালার জঙ্গল বেধে গিয়েছে। 'বৌ-কথা-কও' ডাকচে চারিধারে। কেউটে পাড়ার গায়ে পথের ধারের একটা সোঁদালিফুল গাছে এই আষাঢ় মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়েও

অজস্র ফুল দেখছি। পাটশিমলের মধ্যে কী ভীষণ tropical forest-এর রাজত্ব! ছোটো ছোটো জাম ফলে আছে বুনো জামগাছে—বড়ো বড়ো লতা-বনের মধ্যেটা মিশকালো। পাটশিমলের মোহিনী কাকার সঙ্গে বাঁওড়ের ওপারে একটা চাষাগাঁয়ে দেখা হল। তিনি আমার সঙ্গে গেলেন প্রায় বাগান গাঁ পর্যন্ত। পিসিমার বাড়ি গেলুম তখন সন্ধ্যা হয়েছে। পিসিমার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। দু-জনে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করা গেল। সকালে কোদলার জলে নাইতে গিয়ে দেখি সে টলটলে জল আর নেই নদীর—কচুরিপানায় নদী মজে গিয়েছে, জল রাঙা, ঘোলা—সেইটুকু জলে সব লোকে নাইচে, গোরু বাছুরের গা ধোয়াচ্ছে।

পরদিন সকালে খাওয়া-দাওয়া করে বৃষ্টি মাথায় আবার বাড়ি রওনা হই। সারাপথটা বর্ষা আর বাদলা—কিন্তু খুব ঠাণ্ডা দিনটা। আবার সেই ঘন বন—পাটশিমলে থেকে গোবরাপুরের পথে দু-জন চাষা-লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে এলুম। আবার সেই ঘন tropical forest-এর মতো বন, বড়ো বড়ো কাছির মতো লতা—পথ নির্জন, টুপটাপ করে জল ঝরে পড়ছে গাছের মাথা থেকে, আরণ্যশোভা কী অদ্ভুত! রানীনগরের এপারে একটা সাঁকোর ওপর কতক্ষণ বসে বসে নীল আকাশের পটভূমিতে আঁকা গ্রামসীমার বাঁশবনের দিকে চেয়ে রইলুম। মোল্লাহাটির ঘাট যখন পার হই তখনো খুব বেলা আছে। আজ মোল্লাহাটির হাটবার, হাটে গিয়ে একটা আনারসের দর করলুম। সুন্দরপুরের গোয়ালাদের একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হল। মনে পড়ছিল আজ ওবেলা যখন আসছিলুম পাটশিমলের ঘন ক্ষুদে জামবনের মধ্যের সেই পথটা দিয়ে—মনে হচ্ছিল আমি একজন বন্ধনহীন মুক্ত পথিক, দেশে দেশে এই অপূর্ব রূপলোকের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই আমার জীবনের পেশা। কী আনন্দ যে হয়েছিল, কি অপূর্ব পুলক, মুক্তির সে কি অমৃতময়ী বাণী! কেন মানুষে ঘরে থাকে তাই ভাবি। আর কেনই বা পয়সা খরচ করে মোটরে কি রেলের গাড়িতে বেড়ায়? পায়ে হেঁটে পথ চলার মতো আনন্দ কিসে আছে? সে একমাত্র আছে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ আমি জানি। তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না।

মোল্লাহাটির হাট ছাড়িয়েছি, পথে আমাদের গাঁয়ের গণেশ মুচি নকফুল গ্রামে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছে। ওকে দেখে বড়ো আনন্দ হয়—শান্ত, সরল, সাধু-প্রকৃতির লোক বলে বাল্যকাল থেকে ওকে আপনার-জনের মতো দেখি।

বেলা যাব-যাব হয়েছে দেখে একটু জোর-পায়ে পথ হাঁটতে শুরু করলুম। খুব রাঙা রোদ উঠেছে চারিধারে। খাবরাপোতা ছাড়লুম, সামনে

আইনদ্দির বাড়ির পেছনের প্রাচীন বটগাছটা, আইনদ্দির বাড়ির মোড় থেকে দেখতে পাওয়া সেই দূরপ্রসারী দিগ্বলয়—আজ আবার মেঘভাঙা রাঙা অস্ত-সূর্যের রোদ পড়েচে দূরের সেই সব বাঁশবন, শিমুলবনের মাথায়, ঝিঙেক্ষেতে ফুল ফুটেছে, বৈশাখের গায়ক পাখি পাপিয়া আর 'বৌ-কথা-কও' চারিদিকে ডাকছে, বেলেডাঙার হাজারী ঘোষ গোরুর পাল নিয়ে নতিডাঙার খড়ের মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে, মেয়েরা মরাগাঙের ঘাট থেকে কলসি করে জল নিয়ে যাচ্ছে,—কী সুন্দর শান্ত গ্রাম্য দৃশ্য, একবার মনে হল পাটশিমলের সেই কালীবাড়ি ও দেবোত্তর বাঁশঝাড়ের কথা। আজ দুপুরবেলা সেখানে ছিলাম, কালীবাড়ির পেছনের এক গৃহস্থের বাড়ির বৌ প্রতিবেশিনীকে ডেকে বলছিল—ও সেজ বৌ, একটু তরকারি দেবো, খুকিকে দিয়ে বাটি পাঠিয়ে দ্যাও তো!

সন্ধ্যার আগে কতদূর এসে গিয়েছি। সন্ধ্যাও হল, বাড়ি এসে পা দিলাম, আমার চলাও ফুরুল।

আজ শরতের অপূর্ব দুপুরে পাগল করেছে আমায়। অনেকদিন লিখিনি—নানা গোলমালে অবসাদে মনটা ভালো ছিল না—আজ রবিবার দিনটা দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠেছি—কি পরিপূর্ণ ঝলমলে শরতের দুপুর! এর সঙ্গে জীবনের কী যে একটা বড়ো যোগ আছে—ভাদ্রমাসের এই রোদভরা দুপুরে কেন যে আমায় পাগল করে তোলে! বনে বনে মটরলতার কথা মনে পড়ে, ইছামতীর ঘোলা জল, পাখির ডাক—মনটা যেন কোথায় টেনে নিয়ে যায়। সব কথা প্রকাশ করা যায় না—কারণ আনন্দের সবটা কারণ আমারই কি জানা আছে? কী করচে খুকু এই শরৎ-দুপুরে, বকুলতলায় ছায়ায় ছায়ায়, একথাও মনে এসেছে। ওর কথা ভেবে কষ্ট হয় যে ওর লেখাপড়া হল না।

কাল দিনটি বড়ো সুন্দর কেটেছে, তাই আজ মনে হচ্ছে আজ সকালটিও বড়ো চমৎকার। অনেকদিন কলকাতায় একঘেয়ে জীবনযাত্রার পরে কাল বাড়ি গিয়েছিলুম। প্রথমেই তো খয়রামারির মাঠে দুপুরের রোদে বেড়াতে গিয়ে সবুজ গাছপালা লতাপাতার গন্ধে নতুন জীবন অনুভব করলুম। হাওয়াতেও একটা তাজা গন্ধ আছে যা কিন্তু শহরে নেই। ঝোপে থোলো থোলো মাখন শিমের নীলফুল ফুটেছে, মটরলতার সবুজ ফল ও সোঁদালি গাছের কাঁচা সুঁটি বন-জঙ্গলের শোভা কত বাড়িয়েছে—তাদের ওপর আছে শরতের মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ, আর আছে তপ্ত সূর্যালোক। প্রতিবারই দেখেছি নতুন যখন কলকাতা থেকে আসি এমন একটা আনন্দ পাই। মনে হয় এই তো নীলাকাশ

আছে মাথার ওপর, চারিপাশে বেষ্টন করে রয়েছে ঘন সবুজ গাছপালার ঝোপ, পাখির ডাক আছে, বনফুলের দুলুনিও আছে—এ থেকে তো এতই আনন্দ পাচ্ছি—তবে কেন মিথ্যে পয়সা খরচ করে দূরে যাই! দূর আমায় কী দেবে, এমন কী দেবে, যা এখানে আমি পাচ্ছিনে? আসল কথা দূরও কিছু নয়, নিকটও কিছু নয়—প্রকৃতি থেকে আনন্দ সংগ্রহ করবার মতো মনের অবস্থা তৈরি হয়ে যদি যায় তবে যে কোনো জায়গায় বসে দুটো গাছপালা, একটুখানি সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, দুটো বন্য পক্ষীর কলকাকলি, বনফুলের শোভাতেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায়।

কাল বারাকপুরে গেলুম সকালবেলা। দুপুরে ইছামতীতে স্নান করতে গিয়ে সত্যি বড়ো আনন্দ পেয়েছি। কূলে কূলে ভরা নদী, দু-ধারে অজস্র কাশফুল, আরো কত কী লতা, ঝোপ, বর্ষার জলে সব ঘনসবুজ—চকচক করছে কালো কচুর পাতা, মাখম শিমের নীল ফুল ফুটেছে—একটা গাছে সাদা সাদা বড়ো বড়ো ঢোল-কলমির ফুলও দেখলুম।

বৈকালে যখন খুকু, আমি আর কালো নৌকোতে বনগ্রামে আসি, তখনো দেখলুম দু-ধারে গাছপালার কী অপরূপ রূপ, বনের ফুলের কী শোভা!

ছকু মাঝিকে জিজ্ঞেস করলুম—ওটা কী ফুল ছকু? ছকু বললে—কোয়ারা...

খুকুকে কাশফুল দিয়ে একটা বাংলা সেন্টেন্স তৈরি করতে দিলাম।

রাঙা-রোদ-বৈকালটি মেঘমুক্ত আকাশে, নদীতীরে অপূর্ব শোভা বিস্তার করছে।

কাল রাত্রের ট্রেনে তারাভরা আকাশের তলা দিয়ে যখন এলুম, সেও বেশ লাগছিল।

আজ স্কুলের ছুটি হবে। সুন্দর প্রভাতটি।

আজ সকালটি বড়ো সুন্দর। গুয়া নদীতে হাতমুখ ধুয়ে এসে বটতলায় এসেছি—দূরে সবুজ পাহাড়শ্রেণী—সকালের হাওয়ার একটু যেন শীতের আমেজ। কাল ঘন জঙ্গলের পথে আমরা অনেকদূর গিয়েছিলুম, পথে পড়ল দুখানা সাঁওতালি গ্রাম—বরমডেরা ও কুলামাতো। আর-বছর যে রাস্তা ধরে সাটকিটা গ্রামে যাই, এবার সে রাস্তায় না গিয়ে চললুম সোজা ধনঝরি পাহাড়ের দিকে। বামে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি। সামনে ডাইনে পিছনে চারিদিকেই পাহাড়। নীলঝরনার ওদিকের পাহাড়ের বড়ো বড়ো সামনের চাঁইগুলি নীল আকাশের পটভূমিতে লেখা আছে। ছোটো একটি পাহাড়ি ঝরনা এক

জায়গায়। ঝরনা পার হয়ে দু-ধারে শাল, মহুয়া, তমালের বন, বুনো শিউলি গাছও আছে। একটা ভালো জায়গা দেখে নিয়ে আমরা চা খাবো ঠিক করলুম। বন সামনের দিকে ক্রমেই ঘন হচ্ছে, ক্রমে একধারে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, বড়ো বড়ো বনের গাছে ভরা আর বাঁদিকে অনেক নিচে একটা ঝরণা বয়ে যাচ্ছে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছপালার মধ্য দিয়ে। আমরা দূরে থেকে ওর জলের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। সবাই মিলে নেমে গিয়ে বড়ো বড়ো গাছ ও মোটা কাছির মতো লতা দিয়ে তৈরি প্রকৃতির একটি ছায়াশীতল ঘন কুঞ্জবনে একখানা বড়ো চৌরস কালো শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসে চা-পান করা গেল। টাঙি হাতে একজন সাঁওতাল জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাচ্ছে, বললে—বেশি দেরি করবেন না, একটু পরে এখানে বুনো হাতি জল খেতে নামবে। গাছপালার মাথায় মাথায় শরতের অপরাহ্ণের রাঙা রোদ। সামনে পেছনে বড়ো বড়ো পাথর, একখানার ওপর আর একখানা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে—ওদিকে আরও ঘন জঙ্গলের দিকে ঝরনার পথ ধরে খানিকটা বেড়িয়েও এলুম। বেলা পড়লে রওনা হয়ে ছায়াভরা পার্বত্যপথে হেঁটে আমরা এলুম নীলঝরণার উপত্যকার মুখ পর্যন্ত। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি মাথা খাড়া করে আছে। আশেপাশের বন্য সৌন্দর্য সন্ধ্যার ছায়ায় আরো সুন্দরতর হয়েচে—সেইদিনই যে সুদূর পথে ইছামতীতে আসবার সময় আমাদের ভিটেটাতে গিয়ে মায়ের কড়াখানা দেখেছিলুম—সেকথা মনে পড়ছে। নীরদবাবু ও আমি নীল ঝরনা বেড়িয়ে অনেক রাত্রে বাংলাতে ফিরি।

সকালে উঠে সুবর্ণরেখার পুলের ধারে মাছ কিনতে এলুম। সকালটি বড়ো চমৎকার, নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে চাইলে কত কালের কত সব কথা মনে পড়ে! পুল থেকে চারিধারে চেয়ে দেখি মাছ বা জলের সম্পর্কও নেই কোনো ধারে। নিচে নেমে ছায়ায় একটা শিলাখণ্ডে অনেকক্ষণ বসে রইলুম—ভাবছি সুপ্রভার পত্রের আজ একটা উত্তর দেব। ওখান থেকে ফিরে এসে বাংলোর পেছনে যে পাহাড়ী নদী—তাতে নাইতে গেলুম আমি আর শঙ্কর। সুন্দর নদীর ঘাটটি, পাথর একখানা বড়ো ঘাটে ফেলা আছে, জলের ধারে একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে জলজ লিলি ফুটে রয়েছে। সামনে থই থই করচে পাহাড়শ্রেণী, ঘন সবুজ তার সানুদেশ। দূরে Governor's pool-এর কাছে একটা গাছের আঁকাবাঁকা মাথা সবুজ পাহাড়ি ঢালুর পটভূমিতে দেখা যায়। এ ক-দিনের প্রখর সূর্যালোক আর-বছরের এ সময়ের বর্ষা-বাদলের কথা মনে করিয়ে দেয়...সূর্যের আলো না থাকলে এসব পাহাড়শ্রেণী, এই পাহাড়ি নদী, এই গাছপালা—এই প্রসারতা এত ভালো লাগত? এই এখন বসে আমি বাংলোর বারান্দাতে, দূরে দূরে কালাঝোরা ও অন্যান্য পাহাড়শ্রেণী অপরাহ্ণের পড়ন্ত

রোদে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! দুপুরে মহুলিয়ার পোস্ট মাস্টার এসেছিল, কেষ্ট আবার এসেছিল—ওরা বললে সেদিন যে হাতিঝরনায় গিয়ে চা খেয়েছিলুম, তার ওদিকে বাঁকাই বলে গ্রাম আছে, গভীর জঙ্গল তার ওপারে—ধান পাকলে নিত্য হাতির দল বার হয়। বাসাডেরা ও ধারাগিরির পথ এখন নিরাপদ নয়, কেষ্ট বলছিল। সেদিকে এখন জঙ্গলও খুব ঘন, তাছাড়া বড়ো বাঘের ভয় হয়েছে, অনেকগুলো মানুষ ও গোরুকে বাঘে নিয়েছে এ বছর। সাতগুড়ুমের পথেও বাঘের উপদ্রব হয়েছে এ বছর।

পোস্ট মাস্টার বললে—আপনার জন্যে জমি রেখে দিলে বিষ্টু প্রধান, আর আপনি মোটে এলেন না! নেন যদি, জমি এখনো আছে।

বিজয়ার দিন মহুলিয়া যাব, সেখান থেকে টাটানগর ও চাঁইবাসা।

এইমাত্র পাহাড়ের সানুদেশে বসে হালুয়া তৈরি করে চা খাওয়া গেল। মাথার ওপর অষ্টমীর চাঁদ, আকাশে দু-দশটা তারা, সামনে অরণ্যাবৃত পাহাড়ের অন্ধকার সীমারেখা, দূরে বামদিকে অরণ্য আরো গভীর, মৃদু জ্যোৎস্নালোকে পাহাড়, উপত্যকা, সানুদেশস্থ বনানী অদ্ভুত হয়েছে দেখতে। আজই পট্টনায়েকবাবু বলেছিল ৪নং shift-এ বাঘ আছে, সেজন্যে সন্ধ্যার পরে আমাদের সকলেরই গা ছমছম করছে। রামধন কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে পাছে বাঘভালুক আসে সেই ভয়ে। কেবলই মনে পড়তে থাকে আজ মহাষ্টমীর সন্ধ্যা, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এই সময়টিতে পুজোর চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর আরতি হচ্ছে শঙ্খ-ঘণ্টা রবের মধ্যে, ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে নতুন কাপড় পরে ঘুরচে—আর আমরা সিংভূমের এক নির্জন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত পাহাড়ের মধ্যে বসে গল্প করছি ও প্রকৃতির শোভা দেখছি।[১]

ওখানে থেকে ফিরছি। রুথামের মুদির দোকানের সামনে সাঁওতালি নাচ হচ্ছে, মাদল বাজার তালে তালে। আমাদের একটা কম্বল পেতে দিলে, আমরা অষ্টমীর চাঁদের নিচে পাহাড়ের সামনের ছোটো গ্রামে খাঁটি সাঁওতালি নাচ দেখে বড়ো আনন্দ পেলুম। কবিরাজের সঙ্গে বসে একটু গল্প করা গেল। তার বাংলোর সামনে কবে রাত্রে চিতাবাঘ এসে দাঁড়িয়েছিল, সাঁওতালদের গোরস্থানে সেবারে ভূত দেখেছিল, ইত্যাদি কত গল্প।

মহুলিয়াতে আজ সারা দুপুর ঘুরে বেড়িয়েছি। বাদলবাবুর বাংলো থেকে কালাঝোরের দৃশ্যটি বেশ লাগল। বলরাম সায়রের ধারে সেই গাছটি,

১ এই অংশটি ৪নং Shift-এ বসে লেখা।

নানারকমের পটভূমিতে দুপুরের পরিপূর্ণ সূর্যালোকে কী অদ্ভুত যে দেখাচ্ছিল! তিনটের ট্রেনে গেলাম টাটানগর। বাসে কাশিডি নেমে আশুর বাসা খোঁজ করে বার করি। সে একটা গন্ধরাজ ফুলগাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দু-জনে সন্ধ্যার পরে নিউ এল-টাউনে প্রতিমা দেখে এলাম। লোকজনের ভিড়, মেয়েদের ভিড়, তারপর ওল্ড এল-টাউনের প্রাইমারি স্কুলে ঠাকুর দেখি। একবার আশু বাড়ি এল মোটর লরি দেখতে—পাওয়া গেল না, তারা সব বর্মা জিঙ্কে ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে। হেঁটে বর্মা জিঙ্ক যাবার পথে ডুপ্লে প্ল্যান্ট ও slug ঢালার সময়কার রক্ত আভা থেকে মনে হল আগ্নেয়গিরি কখনো দেখি নি, বোধ হয় এই ধরনের জিনিস হবে। এই সাদা আগুনের স্রোতের মতোই তার উষ্ণ লাভা-স্রোত। বর্মা মাইনসের ঠাকুর সাজিয়েচে খুব ভালো, আবার তার সামনেই একটা কৃষ্ণলীলার ছবি সাজিয়েছে। বাসে স্টেশনে জুগস্লাই ও বিষ্ণুপুর ঘুরে কাশিডি এলাম। পথে বাস হাঁকছে, 'টিনপ্লেট', 'বর্মা জিঙ্ক', যেমন কলকাতায় হাঁকে 'ভবানীপুর', 'আলিপুর'।

সকালে টাটানগর থেকে প্যাসেঞ্জারে বাসায় নামলুম। শ্যামপুর গ্রামখানা পাহাড়ি নদীর ঠিক ওপারে, কাঁকুরে জমি, কাছেই এদেশের ধরনের বনজঙ্গল। পথে সিংভূমের প্রকৃত রূপ দেখলুম, অর্থাৎ উচ্চাবচ ভূমি, পাথরের চাঁই, শাল ও কেঁদ গাছ, রাঙা মাঠ। তিনটের ট্রেনে মহুলিয়া থেকে বাদলবাবু, বিশ্বনাথ বসু প্রভৃতি অনেকে এল। অশ্বত্থতলায় বসে চা খাওয়া গেল। বেলা পড়ে এসেছে। দুটো বাজে। সে সময় আমি একা গেলুম পাহাড়ি নদীর ধারে শালচারার জঙ্গলে—একা বসতে। সামনে পাহাড়শ্রেণী থই থই করছে, দূরে কালাঝোরের নীল সীমারেখা নীল আকাশের কোলে। ঐ দিকে আজ বাংলাদেশে আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারে আড়ং বসেছে, কত দোকানদারের কত বেচাকেনা, কত নতুন কাপড়পরা ছেলেমেয়েদের ভিড়। পাথরের ওপর অপরাহ্নের ঘনায়মান ছায়ায় এক জায়গায় বসে চারিধারের মুক্ত প্রসারতা দেখে কেবলই বাংলাজোড়া বিজয়া দশমীর উৎসব ও কত হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের হাসিমুখ মনে পড়ল। দু-দিনের বিজয়া দশমীর কথা আমার মনে আছে ছেলেবেলাকার। যুগল কাকা সেদিন এসে রান্নাঘর ও বড়োঘরের মাঝখানে উঠোনেতে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে বিজয়ার আলিঙ্গন ও প্রণাম করলেন।...আর যেদিন গঙ্গা বোষ্টমকে আমরা আশুদের চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্মণ ভেবে ভুলে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করেছিলুম।